দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 OCT 1995
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা না নেয়ার সুপারিশ ঃ প্রসঙ্গ কথা

এ, এন রাশেদা

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা হবে না—শিক্ষা সচিবের নির্দেশ শুনে মনে হয়েছিল ভর্তির জন্য কোচিং সেন্টারের যে রমরমা ব্যবসা তা বন্ধের জন্য সরকার সম্ভবত আন্তরিকভাবে কিছু একটা করতে চায়। ভর্তির সঙ্গে আরও জড়িত ছাত্র সংসদের অত্যাচার। ঢাকা শহরের সব ক'টি সরকারি কলেজে ছাত্র সংসদের হাতে বেশ কিছু সিট ছেড়ে দিতে হয় এবং টাকার বিনিময়ে তারা প্রতি ছাত্র ভর্তি করায়। এবার শোনা গিয়েছিল একটি সরকারি কলেজে ডিগ্রি পরীক্ষার সব ফরমই নাকি ছাত্র সংসদের হাতে চলে গিয়েছিল। তাই ক্লাসে এখন দ্বিগুণেরও বেশি ছাত্র। সঙ্গত কারণেই সরকারি কলেজের অনেক শিক্ষকেরই অভিমত, ভর্তি পরীক্ষায় মেধার ভিত্তিতে যদি ভর্তি করা না যায় তাহলে আর শুধু শুধু কষ্ট করে লাভ কি? গত বছর রাজশাহীর কোন এক সরকারি কলেজে এমন করে ছাত্র সংসদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভর্তি না করার কারণে পুরো এক বছর না কি শিক্ষার্থীদের কোন ক্লাসই করতে দেয়া হয়নি। সরকারি কলেজে ছাত্র সংসদ বা ছাত্র সংগঠনের অত্যাচারে ভর্তি পরীক্ষার মেধানুসারে ভর্তি নেয়া যাচ্ছিল না আর বেসরকারি সুনাম অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানে আমলা, মন্ত্রী, এমপি, এমন কি সাধারণ পুলিশ অফিসারের অত্যাচারেও না কি একই অবস্থা হচ্ছিল। আর এক শ্রেণীর বৃহৎ বেসরকারি কলেজ আছে, যারা একই ছাত্রের কাছে ৩ বার ফরম বিক্রি করে ৩ বার তথাকথিত ভর্তির ব্যবস্থা করে শেষ অব্দি সবাইকে ভর্তি করিয়ে নেয়। শ্রেণীকক্ষে জায়গা দেয়ার প্রতিশ্রুতি তাদের নেই, শিক্ষাদানও তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। লুটপাট এবং ব্যবসা তাদের উদ্দেশ্য। এর ওপর আছে পত্রিকা খুললেই প্রতিদিন কোচিং সেন্টারের রঙিন ছবির লোভ দেখানো নৈতিক চরিত্র নষ্ট করার মত বিরক্তিকর বিজ্ঞাপন। এসব অত্যাচারের মাঝে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক যখন অতিষ্ঠ তখন শিক্ষা সচিবের এই বুদ্ধিটিকে মন্দের ভাল বলে অনেকে মনে করেছিলেন এবং প্রচুর লেখালেখিও করেছেন। অত্যাচারে জর্জরিত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরা প্রাণভয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন– 'বেঁচে গেলাম'। কিন্তু সুনাম অর্জনকারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, যারা সমাজকে ভালবেসে এক দায়িত্ববোধ থেকে মহান পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছেন তাদের মধ্যে এর ভয়াবহতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান পূর্বসিদ্ধান্ত বহাল রেখে ভর্তি পরীক্ষা নিয়েছে। কলেজের নিয়ম–কানুন রক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রকৃত মেধার ভিত্তিতে গ্রুপিং করার জন্য শিক্ষাদানের স্বার্থেই ভর্তি পরীক্ষা নিয়েই ভর্তি করতে পারলে ভাল। কেউ বলতে পারেন–পাবলিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কি তা হচ্ছে না? চিন্তাশীল কোন ব্যক্তি বলতে পারবে না, যে তা হচ্ছে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। প্রতিষ্ঠান থেকে উল্লেখ্য সংখ্যক পাস এবং ভাল ফলাফল করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের অনুদান বন্ধের যে হুমকি সরকার দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি এবং কর্তৃপক্ষ নিজেরাই তৎপর দুর্বল ও অমেধাবীদের নকলের সুযোগ দিয়ে ভাল ফলাফল করাতে। আর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সবল প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আর্থিকভাবে সচ্ছল প্রতিষ্ঠানের সংসদ ও সংগঠনের নেতাদের প্রতাপে সেখানে পরীক্ষা হতে পারে—একথা কোন শত্রুও বলতে পারবে না। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন– শিক্ষকেরা করে কি? উত্তরে বলা যায়– ম্যাজিস্ট্রেট পাহারা দেন। যারা একাজ না করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারা কর্তব্য থেকে অব্যাহতি নেন নতুবা লাঞ্ছিত হয়ে পত্রিকার খবর হন। কেউ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। ঢাকা শহরের কিছু কলেজ, ক্যাডেট কলেজ এবং ব্যতিক্রমী কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া সারাদেশের চিত্র প্রায় একই রকমের। অন্তত ছাত্র সংসদের নেতাদের বা সংগঠনের নেতাদের আলাদা ব্যবস্থা করতে না পারলে প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা একই রকম হয়। আবার অনেক বেসরকারি কলেজ নিজেদের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের জন্য ফ্রি স্টাইলের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। তাই শহরের কলেজ ছেড়ে অনেক গ্রামাঞ্চলের কলেজে অনেককেই পরীক্ষা দিতে দেখা যায়—এ খবরগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিদের না জানার কথা নয়। এসব নানা ব্যবস্থাদির মাঝে কোন কোন শিক্ষক যে প্রতিবাদ করেন না– তা নয়। এইসব ধরনের কোন এক অবস্থার বিপাকে পড়ে নকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল সিলেট সরকারি কলেজের প্রভাষক জয়ন্ত কুমারকে। কিছুদিন পূর্বে প্রাণ দিতে হয়েছে আশিয়া মাদ্রাসার প্রভাষককে। প্রতিদিন নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা তো আছেই। পরীক্ষা চলাকালীন বহিষ্কার, পুলিশ, গুলি, টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপের যেসব সচিত্র খবর এবং বাড়ি থেকে খাতা লিখিয়ে আনা এবং পরীক্ষা নেয়া থেকে খাতা দেখা পর্যন্ত শিক্ষকদের হরেক রকমের দুর্নীতির যেসব খবর প্রকাশিত হয়, তাতে কি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে? তাই বলতে হয়, যেসব কারণে এই ব্যাপক হারে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল– সে কারণগুলোর কি নিষ্পত্তি হয়েছে? তাহলে?

পত্রিকার খবর অনুযায়ী গত ৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের যে সভা হল সে সভা জাতিকে দারুণ এক লজ্জায় নিপতিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের সভার সভাপতিত্ব করতে পারেন একমাত্র চ্যান্সেলর– সেখানে শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে যদি সভা হয়ে থাকে তাহলে তা কি বৈধ হল? এতে শুধু ভাইস চ্যান্সেলরদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়নি, সমগ্র জাতি অপমানিত হয়েছে। সেখানে আর একটি বক্তব্য সন্দেহের উদ্রেক করেছে তা হলো– "ভর্তির জন্য সরকার কর্তৃক জাতীয়ভাবে নির্ধারিত কোটা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কোটা প্রথা থাকবে না।" প্রশ্ন হলো জাতীয়ভাবে কোটা নির্ধারণের ক্ষমতা কে রাখবে? তাই কেউ কেউ বলছেন সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি প্রধানমন্ত্রীর ২০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ছাড়া ভর্তির নির্দেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার কারণে প্রতিহিংসাবশত নাকি এত দ্রুত এতসব ঘটনা ঘটানো হচ্ছে।

তবে গত ৯ই সেপ্টেম্বর ফরম বিক্রিকালীন সময়ে ঢাকা কলেজের একদল ছাত্রের তাণ্ডবের এবং ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ছাত্র সংসদের আদার না রাখার কারণে কবি নজরুল সরকারি কলেজের অধ্যক্ষার রুম ছাত্র সংসদ কর্তৃক তালা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে তাদেরই পোষ্য অস্ত্রধারীদের পেটে সরকার আঘাত করেছে। ভর্তির সময় ছাত্র সংসদের কোটা, ছাত্র সংগঠনসমূহের কোটা দু–একটি সংগঠন ব্যতিক্রম আছে)র ভিত্তিতে যে লাখ লাখ টাকা নিরীহ ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা হত তা বন্ধ হবার উপক্রম দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়েছে। যদিও তাদের শায়েস্তা করা সরকারের উদ্দেশ্য ছিল না। থাকলে এতদিনে সরাসরি তা না করে এই বাঁকা পথের আবিষ্কার কেন?

আসলে কোচিং ব্যবসা বন্ধ, শিক্ষার্থীদের হয়রানি থেকে রক্ষা, অভিভাবকদের আর্থিক অপচয় কমানো, প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা– এইসব উদ্দেশ্য কাজ করেনি। তাই যদি হতো তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ হচ্ছে কি করে? কি করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তরুণ তাজা প্রাণ একে একে ঝরে যাচ্ছে? কি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি ছাত্রদলেরই বন্দুক যুদ্ধের কারণে ক্ষণে ক্ষণে ছুটির ঘন্টা বেজে উঠছে? কি করে বি,এন সরকারি কলেজ এক বছর ধরে তালাবদ্ধ থাকছে? কি করে সরকারি বি,এম কলেজ, সরকারি কারমাইকেল কলেজ, সরকারি দেবেন্দ্র কলেজসহ শত শত কলেজ থেকে সরকারি দলেরই ছাত্র সংগঠনের কার্যকলাপে শিক্ষার পরিবেশ উধাও হয়ে যাচ্ছে। আবার কোন কোন সময়ে বিরোধী বড় দলের কারণেও ঘটছে। কাজেই শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যে শিক্ষা সচিবের উদ্দেশ্য নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া ভর্তির নির্দেশ জারি করে শিক্ষা সচিব যে অনধিকার চর্চা করেছেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ পাবলিক পরীক্ষা নিয়েই ভাববার সময় এসেছে। এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শুধু শিক্ষকই প্রহৃত হননি, ম্যাজিস্ট্রেটও লাঞ্ছিত হয়েছেন, পুলিশও প্রহৃত হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের খাতা নেয়ার জন্য সাত বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন থাকলেও পরিচিত ছয় মাসের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের দিয়েও আবার অতিরিক্ত খাতা দেখানো হয়—এছাড়াও আছে নানা অদক্ষতা এবং জালিয়াতি। তাই এ বছর ৫৮ হাজার শিক্ষার্থী তাদের প্রাপ্ত নম্বরের আবেদন করতে বাধ্য হয় এবং তা প্রমাণিত হয় এবং মেধাতালিকাও বদলে যায়। আর একদল আছে যারা ৬০ নম্বরের উত্তর লিখে ৭২ নম্বর পায় এবং পরীক্ষা না দিয়েও ৭০/৭৮ এমন কি লেটারও পায়। যে শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রতিনিয়ত অনিয়ম ও অনৈতিকতার খবর প্রকাশিত হয়– আছে কি তাদের সেই নৈতিক অধিকার– বোর্ডের পূর্বে 'শিক্ষা' শব্দটি যুক্ত করবার। তবুও ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাওয়া আর কি?

কোচিং সেন্টারের প্রলোভন সম্বলিত বিজ্ঞাপনে আমার আপত্তি আছে। ব্যাপারটি নৈতিকতার দোষে দোষণীয়। শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জন করবে নিজের তাগিদে– তাকে এত প্রলুব্ধ করার কি আছে? কম্পিউটার, টিভি ইত্যাদি ছাড়াও আছে কলকাতা, দিল্লী, কাঠমন্ডুর টিকেট—এ বড়ই লজ্জার। শিক্ষাদান সিস্টেমেও কিছু আপত্তি আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে দোষ তো কোচিং সেন্টারের নয়। এ দোষ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য–উদ্দেশ্য– জ্ঞান অর্জন কিংবা সমাজ সভ্যতার বিকাশ সাধন নয়; লক্ষ্য দ্রুত অর্থ উপার্জন– তা সে কোন পন্থায়ই হোক না কেন। যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা হয় না তাই শিক্ষার্থীরা সে কারণেও কোচিং সেন্টারে যায়।

মাথা ব্যথা হলে তা কেটে ফেলতে হয় না। সঠিক ওষুধ সেবন করতে হয়। ভুল হলে লাভ না হয়ে ক্ষতি হয়। কাজেই ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ করার নির্দেশ বা সুপারিশ করে যেসব স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে তা সফল হবে না। বরং ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ হবে, যা সামাল দেয়া আগামী কয়েক বছরেও সম্ভব হবে না।

যদি সত্যি সত্যি কেউ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি চায় তাহলে শিশু থেকেই শিক্ষার্থীদের মানুষরূপে গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরি করুন। ৪০ জনের ক্লাসে গাদাগাদি করে ৯০ জনকে ঢুকিয়ে দিয়ে নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা না করার পরামর্শ দিন এবং তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের পথ দেখিয়ে দিন। পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষকদেরকে ম্যাজিস্ট্রেট যাতে পাহারা দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করুন। মূল্যায়নের ধারা পাল্টিয়ে দিন। সারা বছর ধরেই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া থাকলে ম্যাজিস্ট্রেটের দরকার হবে না, পুলিশ বি,ডি,আরও নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনমত ১২ বছর ধরে মূল্যায়ন করে ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করুন। তাতে সমাজে অর্ধশিক্ষিত সার্টিফিকেটধারী বেকারের সংখ্যা কমবে। জালিয়াতির মাধ্যমে সার্টিফিকেটের মালিক হয়ে মিথ্যে অহংবোধ কমবে। শহরের দিকে ধাবিত হওয়ার তাগিদ কমবে। উচ্চ শিক্ষায় যারা যেতে পারবে না তারা নানা ধরনের কর্মমুখী শিক্ষায় যেতে পারবে– এখন যেখানে ভিড় কম। অনৈতিকতার পথে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, যার জন্য কর্মমুখী শিক্ষায় অনেকেই যেতে চায় না।

ভারতবর্ষে যারা প্রকৌশল শিক্ষায় যেতে চায় তাদের আইআইটি'র বিশাল সিলেবাসের পড়া শিখে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। যারা অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় তাদের কি ধরনের কঠিন কঠিন বৈতরণী পার হতে হয় সে খবর শিক্ষা সচিবের বা মন্ত্রণালয়ের অজানা নয়। তারপরও তারা এক সভা করে বলে দিলেন পৃথিবীর কোথায় ভর্তি পরীক্ষা হয় না। অসত্য উদাহরণ দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য কি মহৎ হতে পারে? উচ্চশিক্ষা সব দেশেই সবার জন্য নয়। যারা মেধাবী তাদেরই আসা উচিত বলে শিক্ষাবিদরা এ যাবৎকাল মনে করে এসেছেন। এখন তা দুর্নীতিবাজ এবং নকলবাজদের জন্য করতে গেলে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোই যে চিরতরে হারিয়ে যাবে তা সহজেই অনুমেয়। যারা উচ্চশিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের সুপারিশকে স্বাগত জানিয়েছেন তারা ব্যাপারগুলি ভেবে দেখবেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি পরীক্ষা হবে কি হবে না তার সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের সভায় তা হওয়ার কথা নয়। '৭৩–এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সে কথাই বলে।